# বাংলার স্ত্রী-আচার

শ্রী ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী-সংকলিত

বাংলার স্ত্রী-আচার

# বাংলার স্ত্রী-আচার

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী - সংকলিত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

# মুখবন্ধ

বাংলার স্ত্রী-আচার সম্বন্ধে যদিও আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খুব কমই আছে তবু মেয়েদের স্বাভাবিক অনুষ্ঠানপ্রিয়তাবশতঃ অনেকদিন থেকেই এগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখবার ইচ্ছা আমার মনে জেগেছে এবং ছেলেবেলা থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মতো বড় একান্নবর্তী পরিবারের কিছুটা সংস্পর্শে আসার দরুন একেবারে যে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না, তাও নয়। বেশ মজা লাগত যখন দেখতুম যে, এক-শ বছর ধরে যে স্ত্রী-আচার বংশানুক্রমে পালিত হয়ে এসেছে, সে সম্বন্ধেও অল্পবয়স্কা কন্যাবধূগণ বর্ষীয়সী গিন্নীদের পদে পদে জিজ্ঞাসা না করে অগ্রসর হতে পারতেন না। এ বিষয়ের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি মনে রাখা এতই কঠিন, অথচ কোনো কিছুর ভুল হওয়া তাঁরা শুভকার্যের অঙ্গহানি বলে গণ্য করতেন। আমার অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয়াও তাঁদের ভাবীকালের শুভকার্য সুসম্পন্নের সাহায্যকল্পে আমাকে এইসব আচারের কথা লিখে রাখতে অনুরোধ করেছেন। প্রত্নতত্ত্বের গভীর গহনে পথ কেটে বের করবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা আমার নেই। তবে বহুকালাবধি এইরকম একটা অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে যে, বাংলার স্ত্রী-আচার বেদবেদান্তেরও পূর্বকাল থেকে এ দেশে প্রচলিত।

'এটা করতে নেই' এবং 'এটা করতে আছে'—এই দুই মলাটের মধ্যে আবদ্ধ সরল পীনাল কোড যে এতকাল ধরে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত এবং ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছে, সেইটেই তার মাহাত্ম্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কালের স্রোতে কত পুরাতন আচার-বিচার ভেসে যায় ও কত নূতন বিচার-আচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবু তার মধ্যে কতকগুলি থেকে যায়। সেই চিরন্তন প্রথার মধ্যে বাংলার স্ত্রী-আচার স্থায়িত্বের দাবি করতে পারে।

প্রথমে মনে করেছিলুম জাতি ও সম্প্রদায় -ভেদের ভিত্তির উপর আচারের পার্থক্য স্থাপনা করব। তার পর কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন এবং আমার মনে হল সেইটেই ভালো যে, আঞ্চলিক পার্থক্যের উপর আচারভেদের স্থাপনা করাই যুক্তিসংগত। দুঃখের বিষয়, জাপানী যুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্যে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন আসবার সময় আমার সযত্নসঞ্চিত কতগুলি স্ত্রী-আচারের বিবরণ হারিয়ে গেল। তবু যে রণে ভঙ্গ দিই নি, তাতে স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অধ্যবসায় (শত্রুপক্ষ বলবেন জেদ!) প্রকাশ পায়। শান্তিনিকেতনের আমার যেসকল আত্মীয়বন্ধু এই নব-সংকলন-কার্যে সাহায্য করেছেন, তাঁদের আমার জীবনসন্ধ্যায় এইমাত্র আশীর্বাদ জানাই যে, তাঁরা যেন এই আচার অনুসরণ করে টুকটুকে সুন্দর বউ ঘরে আনতে পারেন এবং নাতি-নাতনীর সুন্দর মুখ দেখে তৃপ্তি লাভ করেন।

এই বইটিতে বাংলাদেশের চারটি অঞ্চলের স্ত্রী-আচারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি লিখেছেন শ্রীমাধবী ভট্টাচার্য। ইনি মহর্ষিদেবের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের দুহিতা। সুতরাং তিনিও একটি বড় একান্নবর্তী পরিবারের বহু অনুষ্ঠানে বহু স্ত্রী-আচার দেখবার সুযোগ পেয়েছেন এবং এ বিষয়ে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য থাকার জন্য মনেও রাখতে পেরেছেন। কলকাতা শহরকে পশ্চিমবঙ্গ বলাই বোধ হয় ভৌগোলিক অর্থে ঠিক। আবার কেউ কেউ বলেন ঠাকুরবাড়ির আচার-অনুষ্ঠানে যশোর-খুলনা অঞ্চলের আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব আছে।

মহর্ষিদেবের পত্নী সারদা দেবী থেকে আরম্ভ করে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবী পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ির অনেক বধূই যশোরের মেয়ে। সুতরাং এই প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্র নয়। দ্বিতীয় বিবরণটির লেখিকা শ্রীকমলা দেবী জোয়াড়ের বিশী পরিবারের বউ। সুতরাং তাঁর লেখাটি উত্তরবঙ্গের আচারের বিবরণ বলাই বোধ হয় ঠিক। শ্রীঅমলা সেন নিজেই বলেছেন তাঁর বিবরণ শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের। তাঁর উল্লিখিত কতগুলি আচারের বিশেষত্ব ও নূতনত্ব আছে বলে আমাদের মনে হয়। শ্রীশৈবলিনী সেন যে এই বৃদ্ধবয়সে আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন এবং সাধ্যমত স্মৃতিমন্থন করে পূর্বপ্রথা অন্যকে দিয়ে লিখিয়েছেন, সেজন্য আমি বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ।

আমার মনে হয় বাংলাদেশের নারীমাত্রেরই এ বিষয়ে ঔৎসুক্য আছে। যদি তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলের আচারের আরও কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য আমাকে লিখে পাঠান তবে পরবর্তী সংস্করণ সম্পূর্ণতর করবার সাহায্য হতে পারে।

আমাদের সেকালের স্ত্রী-আচারের একটি গান সেই সুদূর কাল থেকে বেতার বার্তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে কানে ভেসে আসছে, সেই মধুরেণ সমাপন করি—

আয় আয় আয় সবে আয় বরণডালা মাথায় নিয়ে,
আয় আয় সোনার জামাই বরণ করি শাঁখ বাজিয়ে।
নবীন রসিক বর সাবধানেতে বরণ কর্,
দেখো যেন যেয়ো নাকো ছাঁদলাতলায় মন হারিয়ে।

সেইসঙ্গে কত স্মৃতিও ভেসে আসে, যথা—

একজন নবীন রসিক বিলাত-ফেরত বর বিদেশ থেকে ঠিক গায়ে

হলুদের দিন পৌঁছে সেই ট্রেনের কোট প্যাণ্ট পোশাকেই কলাতলায় এসে দাঁড়ালেন ; সেই বরেরই ক্ষুদে শ্যালকেরা অলক্ষ্যে থেকে তাঁর ন্যাজ তৈরি করে দেওয়ায় তিনি উঠে লোকের সামনে সেই লাঙ্গুল আস্ফালন করে বলতে লাগলেন যে, "আমার বেশ একটি নতুন অঙ্গ লাভ হল।" কুইনীন দিয়ে জল খেতে দিলে "এই ম্যালেরিয়ার দেশে খেলে খুব উপকার হবে" বলে ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেললেন। মোট কথা, তাঁকে কিছুতেই অপ্রতিভ করতে না পেরে প্রতিপক্ষরাই জব্দ হল। আর একজন হিন্দুস্থানী বর তাঁদের দেশে শ্বশুরবাড়িতে রাত্রিযাপন করা নিয়ম নয় বলে বাসর-ঘরের আমোদপ্রার্থিনীদের নাকের সামনে দিয়ে কনেকে নিয়ে চলে গেলেন, কেউ কিছু বলতে পারলে না। জোর যার মুলুক তার।

আরও কত স্মৃতি মনে ভিড় করে আসে, কিন্তু গোড়ায় 'মুখবন্ধ' লিখে যে গলদ করে বসে আছি, তার শেষরক্ষা করবার জন্য এইখানেই পাঠকদের অব্যাহতি দিতে বাধ্য হলুম।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ যে আমার এই সামান্য প্রচেষ্টাকে যত্নপূর্বক সংশোধন করে প্রকাশ করেছেন এবং আমার বহুদিনের একটি ইচ্ছাকে পূরণ করেছেন, তার জন্যে তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

শান্তিনিকেতন,
২৫ বৈশাখ ১৩৬৩

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

# বিষয়সূচী

## চিত্রসূচী

বাংলার স্ত্রী-আচার

১

## পশ্চিমবঙ্গ

### গাত্রহরিদ্রা

প্রথমে ছোট আকারের চারটি কলাগাছ চারটি মাটির তাল করে তাতে পুঁতে দেয়, চার ধারে চারটি চৌকো ঘরের মতো করে সাজিয়ে দেয়। মাঝখানে একটি পিঁড়ি পাতা যায় এমন ভাবে জায়গা রাখতে হয়, সেইখানে একটি পিঁড়ি পেতে রাখে ; এ পিঁড়িতে আলপনা দেওয়া হয় না। একেই বলে কলাতলা। লগ্ন উপস্থিত হলে সেইখানে বরকে বা কনেকে দাঁড় করাতে হয়। প্রথম বর বা কনে লালপাড় ধুতি বা শাড়ি পরে দাঁড়াবে—নাপিত বা নাপতিনি এসে বর ও কনের নখ চেঁচে দেবে, তাকে বলে বর-কামানো বা কনে-কামানো। তার পর গায়ে হলুদ ছোঁয়াতে হয়। উপকরণ হচ্ছে হলুদ তেল, মাথাঘষা-বাঁটা— একটি ঘটিতে জল রাখে। পাঁচ জন (কিংবা তিন জন) এয়োস্ত্রীলোক বরের কপালে তিন বার করে সেই হলুদ

তেল মাথাঘষা-বাঁটা ছুঁইয়ে দেবে, ও ঘটির জল বরের মাথায় ছিটিয়ে দেবে। সেই সময় শাঁখ বাজাতে হয়, মেয়েরা উলু দেয়, বাজনা বাজে। একেই বলে গায়ে হলুদ দেওয়া। বরের কপালে ছোঁয়ানো হলুদ কনের বাড়ি পাঠানো হয়। কনের বাড়িতেও ঠিক ঐরকম কলাতলা করে রাখতে হয়। একইরকম প্রথায় কনেরও গায়ে হলুদ দিতে হয়। বরের কপালে ছোঁয়ানো হলুদের সঙ্গে আরো কিছু উপকরণ কনের জন্য দিতে হয়; যেমন: বেসন, রূপটান, গন্ধতেল; মাথাঘষা-বাঁটা বেশি করে দেয়, কারণ হলুদ ছোঁয়ানো হলে কনে ঐ মাথাঘষা দিয়ে মাথা ঘষে রূপটান মেখে সেদিন স্নান করে। তত্ত্বে এই জিনিসগুলি দিতে হয়— একটি ছোট কলসী করে তেল, একটি লালপাড় শাড়ি, একটি লাল গামছা, একটি গামলায় বেসন, একটি জলচৌকি, মাদুর, দৈ, মাছ, সন্দেশ। তার পর যার যেমন অবস্থা সেই ভাবে তত্ত্ব করে, যেমন জামা শাড়ি, প্রসাধনের উপকরণ, ইত্যাদি। খাবার তো থাকেই। পান-সুপারি দিতে হয়, পানমসলা, খয়ের, বড় এলাচ, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, জৈত্রি, ধনের চাল, মৌরি, তবকমোড়া পান। ফুলের মালা ও আশীর্বাদী পিরিচ একটি দেয়, সেই পিরিচে ধানদূর্বা থাকে, চন্দন ঘষে একটি বাটিতে দেয়, ও একটি টাকা দিতে হয়। এটি ব্রাহ্মণ হাতে করে নিয়ে যাবে, নাপিত মাছ কিংবা দই নিয়ে যাবে। একটি কাজললতার মধ্যে কলার মাঝ— যাকে কলার পেটো বলে— সেই একটু দেওয়া থাকে আর লাল সুতো দিয়ে কাজললতা বেঁধে দিতে হয়। কনের হাতে সেই কাজললতা রাখতে হয়, বাসি বিয়ের পর কাজললতা ছাড়তে হয়।

## নাড়ুকোটা

নাড়ুকোটা রীতটি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আছে, আমি যা দেখেছি লিখছি। গায়ে হলুদের পর দিন নাড়ুকোটা হয়। প্রথম ঢেঁকিতে চালকোটা হয়। রীতের চালকোটা হবে বলে ঢেঁকিকে আগে পূজা করে নেওয়া হত, তেল সিঁদুর গঙ্গাজল ছিটিয়ে। ঠাকুরবাড়ির নারায়ণ পূজারী এসে সকালে ফুল দিয়ে মন্ত্র পড়ে পূজা করত। তার পর ঝিয়েরা নতুন বিয়ে-বাড়ির রঙকরা গোলাপী রঙের কাপড় পরে ঢেঁকিতে চাল কুটত। চাল কোটা হলে সেই চাল খুব মিহি করে চেলে নেওয়া হত— সেই চালের গুঁড়ি, গুড়, নারকেল-কোরা, খোয়া ক্ষীর সব এক সঙ্গে বড় বড় বারকোসে বামুনরা মাখত, মেখে বড় বড় তাল করে রাখত।— এবং দোতলার অন্দরমহলের বারান্দায় একটি পিঁড়ি পেতে বরকে বসানো হত ; মাথায় একটি উড়ুনি ধরা হত, তার পর ছোট একটি থালাতে ঐ বড় বড় মাখা তাল থেকে মাঝারি পাঁচটি তাল সেই থালায় দেওয়া হত এবং একটি কালো নুড়ি ঠাকুরবাড়ি থেকে এনে মাঝের তালটিতে বসানো হত ; একটি সোনার হার জড়িয়ে দেওয়া হত, তার পর তাতে তেল সিঁদুর মাখিয়ে তিন জন এয়ো সেই চাদরের তলায় বসে বরের কিম্বা কনের কপালে ঠেকাবে— এই ভাবে তিন বার ছোঁয়াবার পর সেই পাঁচটি তাল থেকে একুশটি নাড়ুর মতন পাকিয়ে দেবে বর কিম্বা কনে। সেই একুশটি নাড়ু ঠাকুরবাড়ি নারায়ণের সেবায় যাবে। তার পর বড় বড় যেসব তাল থাকত, তার থেকে মেয়ে-বউরা হাসিঠাট্টা গল্প করতে করতে নাড়ু পাকাত, একটু একটু কাঁচা নাড়ুও যে খেত না তা নয়। সেই নাড়ু সব ভাজা হয়ে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও কুটুমবাড়ি ছোট ছোট হাঁড়ি করে পাঠানো হত। এই নাড়ুর নাম আনন্দনাড়ু।

## বিবাহের রীত : বরের বাড়ি

বিবাহের দিন সকালে বরের বাড়ি থেকে শ্রী ও আলপনা দেওয়া পিঁড়ি আনতে যায়, কনের বাড়ি থেকেও যায়। একটা ভালো দিন দেখে এই শ্রী গড়তে ও পিঁড়িও আলপনা দেবার জন্য পাঠাতে হয়। বর বা কনের বাড়িতে আলপনা দেয় না ও শ্রী গড়ে না; কোনো আত্মীয়বাড়ি গড়তে দেয়। শ্রী ও পিঁড়ি আনার নিয়ম এই— এইসকল উপকরণ দিতে হয়— একটি বড় বাটি করে তেল, দই, মাছ, শাড়ি, সিঁদুর, শাঁখা, লোহা, পান, সুপুরি, হলুদ, বাতাসা, খই, মুড়কি, মিষ্টি। একজন ব্রাহ্মণ ও নাপিতকে সঙ্গে যেতে হয়, ব্রাহ্মণ শাঁখ নিয়ে যায়, সঙ্গে বাজনা যায়, যখন নিয়ে আসে ব্রাহ্মণ শাঁখ বাজাতে বাজাতে শ্রী আনে, নাপিত পিঁড়ি আনে। ছেলের বাড়ি হলে একটি পিঁড়ি, মেয়ের বাড়ি দুটি আলপনা দেওয়া পিঁড়ি দরকার হয় বর ও কনের জন্য। শ্রী ও পিঁড়ি এসে পৌছলে, তবে বর বা কনের বাবা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বসেন— বরের নান্দীমুখ হয়ে গেলে আভ্যুদায়িকের থালা কনের বাড়ি পাঠাতে হয়, সে থালাটি নীতবর সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আগেকার দিনে নীতবর হওয়া খুব রেওয়াজ ছিল। সেই আভ্যুদায়িকের থালা কনের বাড়ি যায়— কনের নান্দীমুখের সময় দরকার হয়, না হলে কনের নান্দীমুখ হয় না। বরের মা সারাদিন উপোস করে থাকে; নিয়ম শুনেছি যে মা যত শুকোবে মেয়ে ছেলে তত সুখী হবে। বিকেলবেলা বর যাত্রা করবার আগে সেই গায়ে হলুদের কলাতলায় বর নাওয়ানো হয় ঐ একই ভাবে গায়ে হলুদের মতন হলুদ তেল ছুঁইয়ে, জল ছিটিয়ে। তার পর বর সাজতে যায়; বরের সাজ তখন বাস্তবিক বরসজ্জাই হত। বরের কপালে বেশ ভালো করে চন্দন পরানো হত, বেনারসি জোড়, গরদের পাঞ্জাবি, হীরার বোতাম, গলায় হীরার কণ্ঠি,

মুক্তোর মালা, চার-পাঁচটি হীরা-পান্নার আংটি, জরির লপেটা জুতো, মাথায় টোপর, হাতে রুপোর জাঁতি ও রুপোর দর্পণ—এই সাজ পরে বর এইবার কলাতলায় আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে এসে জুতো খুলে দাঁড়াবে। মা ছেলেকে বরণ করবে, মা পরবে লাল বেনারসি শাড়ি কিংবা লালপাড় গরদ ; কারণ সুতি শাড়িতে বিয়ের কোনো কাজ করতে নেই। এই বিয়ের আগে যেমন শ্রী ও পিঁড়ি গড়তে দেয়, সেইরকম বরণের জন্য ভাঁড় ও কুলাও কুমোরবাড়ি গড়তে দেয়। একটি ছোট কুলো, তাতে নানা রঙ করে লতাপাতা ফুল এঁকে দেয়, চারটি ছোট ভাঁড়, তার চারটি ঢাকনি ও একটি আইভাঁড় ; এ সবই তেল ও রং দিয়ে নানারকম চিত্র করে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসত। বরণের সময় এই-সব উপকরণ লাগে— শ্রী, ভাঁড়, কুলো, জলের ঘটি, প্রদীপ, ধানদূর্বা। মা প্রথম ধানদূর্বা দিয়ে ছেলের পায়ের কাছ থেকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কপালের কাছ পর্যন্ত তুলে কপালে ঠেকাবে, এই ভাবে তিনবার করবে তার পর সেই ধানদূর্বা ছেলের মাথার উপর দিয়ে ফেলে দেবে। তার পর জলের ঘটি ঐভাবে বরণ করে নামিয়ে রাখবে ; তার পর ছোট চারটি ভাঁড় থেকে দুটি করে নেবে, নিয়ে একই নিয়মে বরণ করবে। বড় ভাঁড়টির মধ্যে একটি প্রদীপ থাকে, প্রদীপ জেলে ঐ ভাঁড় প্রদীপ-সুদ্ধ বরণ করবে। তার পর প্রদীপ বার করে হাতে নিয়ে প্রদীপের শিখার তাপ নিয়ে নিয়ে ছেলের সমস্ত গায়ে ঠেকিয়ে দেবে। তার পর শ্রী দিয়ে বরণ করবে। তার পর সব ভাঁড়-ক'টি ও কুলো-সমেত বরণ করে সব সরিয়ে রাখবে। এখন ঐ ছোট চারটি ভাঁড়ের মধ্যে কি উপকরণ লাগে লিখছি—কিছু কালো আস্ত মুগ ও কিছু আতপ চাল হলুদবাঁটা দিয়ে রঙ করে শুকিয়ে নেবে, একটি করে বাতাসা একটি করে হলুদ একটি করে কড়ি ও একটি

করে পানের মসলাবিহীন খিলি করে ঐ চারটি ভাঁড়ে ভাগ করে দিয়ে দিতে হয়। এইবার বরণের পর মা ছেলের কাছ থেকে কনকাঞ্জলি নেবে। ছোট একটি থালাতে অল্প আতপ চাল একটি টাকা দিয়ে ছেলের হাতে দিতে হয়, দিয়ে মা সামনে আঁচল পেতে দাঁড়ায় ও ছেলেকে তিন বার জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা, কোথা যাচ্ছ ?' ছেলে বলে, 'মা, তোমার বউ আনতে যাচ্ছি।' আগে বলত, 'তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।' এখন আর সে কথা কেউ বলে না। তার পর তিনবার সেই কথাটি বলে মায়ের আঁচলে ঐ চাল ঢেলে দিয়ে নারায়ণ প্রণাম ও মাকে প্রণাম করে যাত্রা করে। মাকে ছেলের যাত্রা দেখতে নেই। যাত্রার সময় এইসমস্ত দেখে যাত্রা করে— নারায়ণ, এয়োস্ত্রীলোক, পাঁচরকম শস্য, পূর্ণ কলস, দই, মধু।— ছেলে যাত্রা করবার সময় পুরোহিত মন্ত্র বলতে বলতে নিয়ে যান। যাত্রা করে আর ফিরতে নেই। একেবারে গাড়িতে উঠবে এবং গাড়ির তলায় এক কলসী জল ঢেলে দিলে বর যাত্রা করে। এই হল বিয়ের দিনের রীত। সম্প্রদান হয়ে গেছে এই খবর মায়ের কানে দিতে হয়; দিলে সারাদিনের উপোসের পর ঐ কনকাঞ্জলির চাল মা একটু ফুটিয়ে মুখে দেন ও দুধ-মিষ্টি খান।

### বিবাহের রীত : কনের বাড়ি

বিকেল বেলা গায়ে হলুদের কলাতলায় ঠিক বরের মতন একই নিয়মে তেল হলুদ ছুঁইয়ে কনে নাওয়াতে হয়। তার পর কনের সাজ হয়। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কনেকে বিয়ের দিন লাল বেনারসি ও সোনার গয়না পরানো হত। বিয়ের দিন জড়োয়া গয়না পরানো হত না; সেটা পরে যৌতুক দেওয়া হত। বিয়ের দিন নিয়ম ছিল কনে লাল ছাড়া

অন্য রঙের কাপড় পরবে না ; এখন নীল রঙও পরে, হলুদ রঙও পরে। কনের সাজগোজ হলে তাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা পিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসানো হত। সেই পিঁড়িতে হলুদমাখানো কিছু চাল থাকত, একটা হলুদে-ছোপানো নতুন কাপড়ের টুকরো দিয়ে ঢাকা থাকত, পিঁড়িটা উল্টো করে পাতা থাকত— সেটা যে কি ব্যাপার ঠিক জানি না। তার পর কনেকে তুলে মেয়েমজলিসে বসানো হত। ছাউনিতলা নানা ভাবে আলপনা দেওয়া থাকত, সেই কলাতলায় তখন একটি আলপনা-আঁকা পিঁড়ি রাখা হত বর দাঁড়াবে বলে, বরণের সব উপকরণ গোছানো থাকত। কনের বাড়ির রীত একটু অন্য রকম— বর-মাপা শরকাঠি দুটি, হাতবাঁধা লাল সুতো, পানসুপারি, কড়ি, তা ছাড়া বরণের শ্রী, বরণের ডালা, জলের ঘটি, ধানদূর্বা, ভাঁড়, কুলো। এখন বিকেলে বিয়ের দিন কনের বাড়ির আর একটি রীত আছে, তাকে বলে হাইআমলা বাঁটা ও মোনামুনি ভাসানো। দুটি মোনামুনি ও ঠিক দুটি ছোট এলাচ। হাইআমলা জিনিসটা কিছু আমলার টুকরা বলেই মনে হয়। যাই হোক, কনে নাওয়ানোর আগে এই রীত হয়— দুইজন এয়োস্ত্রী, বিশেষ করে যাঁরা খুব স্বামীসোহাগিনী, এই রকম মেয়ে বৌ বেছে নিয়ে দুজন হাইআমলা বাঁটতে বসানো হত। মাথার উপরে একটি উড়ুনির ছাউনি দিত, তলায় শিল পাতা। দুজনে নোড়া ধরে সেই আমলা বাঁটবে, দুজনে দুজনকে সন্দেশ খাইয়ে দেবে ; যতক্ষণ না বাঁটা হবে সন্দেশ খেয়ে ফেলতে নেই, গালে রাখতে হয়। তার পর বাঁটা হলে একুশটি পানে সেই আমলা-বাঁটা একটু একটু দিয়ে দেয়। তার পর মোনামুনি দুটি ছোট গামলায় জল দিয়ে ছেড়ে দেয়, জলটি একটু নাড়িয়ে দেয়— সে দুটি ভাসতে ভাসতে যদি খুব তাড়াতাড়ি জোড়া লাগে তা হলে বলে, বরকনের খুব

ভাব হবে। দেরি হলেই সকলের মুখ শুকিয়ে যায়, বলে, এদের বনবে না, নিশ্চয় ঝগড়া হবে। এই রীতটি খুব হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে হয়। বরণের উপকরণের মধ্যে হাইআমলা-বাঁটা দেওয়া একুশটি পান রাখতে হয়। আর বর ছাউনি নাড়ার সময় আসবার আগে একুশটি ধুতুরার ফলের প্রদীপ একটি ছোট কুলোতে সাজিয়ে রাখতে হয় সলতে দিয়ে।

প্রথম কনের বাড়ি থেকে, বাড়ির গুরুজনস্থানীয় কেউ কেউ বর আনতে যাওয়ার নিয়ম আছে। বর এসে কনের বাড়িতে পৌছলে আগে তাকে সভাতে বসানো হয়, তার পর জামাইবরণ হয়। কনের বাপ জামাইকে একটি আঙটি, একটি জোড়, পৈতে, মালা-সুদ্ধ একটি থালা দিয়ে বরণ করেন। কনের বাড়ির সেই কাপড় পরে বিয়ে হয়। তার পর বরকে অন্দরমহলে স্ত্রী-আচারের জন্য আনা হয়। ছাঁদ্‌নাতলায় যাবার আগে ধুতুরার প্রদীপগুলি জ্বেলে বরের মাথা ডিঙিয়ে কুলো-সুদ্ধ ফেলে দিতে হয়। তার পর বরকে ছাউনি নাড়ার জায়গায় আনে— ঐ জায়গাটাকেই বলে ছাঁদনাতলা— বরকে সেই আলপনা-দেওয়া পিঁড়িতে দাঁড় করায়, কনের মা বরকে প্রথম ধানদূর্বা দিয়ে বরণ করেন— কি ভাবে বরণ করতে হয় আগে লিখেছি। এখানে নতুনের মধ্যে হাইআমলা-বাঁটা পান বরের গায়ে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে ফেলতে হয়, শরকাঠি দিয়ে বর মাপতে হয় এবং মাপা হলে কাঠির মাথাটি ভেঙে রাখতে হয়, তার পর ভাঁড় কুলো প্রদীপের তাপ এইসব দিয়ে একই ভাবে বরণ হবে। বরণের আগে বরের হাত লতা ও লাল সুতো দিয়ে বেঁধে দিতে হয়, হাতে দিতে হয় আস্ত পান, একটি সুপারি, একটি কড়ি ইত্যাদি। বরণ হয়ে গেলে সেই জিনিসগুলি হাত থেকে খুলে কনের মায়ের আঁচলে ঢেলে দেয়। কনের মার বরণের পর সাতজন এয়ো বরণডালা, জলের ঘটি, ভাঁড়, কুলো, আইভাঁড়, শ্রী— এই-

সব নিয়ে সাতবার বরকে ঘিরে ঘোরেন। প্রথম জল, তার পর শ্রী তার পর ভাঁড় কুলো ও তার পর আইভাঁড় ও বরণডালা। সাতবার ঘোরার পর কনেকে আনা হয়। তখন বরের সামনে একটি লালপাড় শাড়ি আড়াল করে ধরে কনেকে এনে বলা হয়, 'বর বড় না কনে বড়?' তিনবার বলে তার পর কনেকে সাত পাক ঘোরানো হয়। ঘোরানো হয়ে গেলে মুখের আড়াল দেওয়া কাপড় খুলে নিয়ে বর ও কনের মাথার উপর ধরে, এইবার শুভদৃষ্টি হয়। শুভদৃষ্টির সময় আগে মালাবদল— বরের মালা কনের গলায় দেয়, কনে তার মালা বরের গলায় পরিয়ে দেয়। তিনবার এই রকম পরাবার নিয়ম। তার পর বলে, 'ভালো করে চেয়ে দেখো'— ছোট ছোট ফুলের তোড়া উভয়ে উভয়ের হাতে দেয় ও ঝুরো ফুল ছড়ায়। এইখানে স্ত্রী-আচার শেষ— তার পর সম্প্রদান। সম্প্রদান শেষ হলে বরকনে অন্দরমহলে আসে। হাত ধরে আসতে হয়। বরের ডান হাতের কড়ে আঙুল কনে তার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে ধরে আসে। সম্প্রদানের সময় গাঁটছড়া বাঁধা হয়। অন্দরমহলে মেয়ে-মজলিসে বরকনে এসে বসলে যৌতুক খেলানো হয়, তাকে বলে ভাঁড়কুলো খেলানো। তার নিয়ম হচ্ছে, প্রথম চারটি ছোট ভাঁড়ের ঢাকা কনে খুলে রাখবে, বর বন্ধ করে দেবে, তিনবার এই রকম করবার পর ঐ ভাঁড় থেকে কিছু কিছু চাল সুপারি বাতাসা পান অল্প অল্প করে ঢেলে কনের হাতে দেবে, কনে সেগুলি মসলন্দে ফেলবে, বর আবার কুড়িয়ে হাতে দেবে; সব তিনবার করে হবে। তার পর বর তার ধুতির কোঁচা দিয়ে সেই ভাঁড় চারটি ঢেকে দেবে, কনে বাঁ হাতে করে খুলে দেবে, তার পর সেখানেও মালাবদল হবে, মুখে মিষ্টি দেবে, পান দেবে, আতর মাখিয়ে দেবে। এইখানে বিয়ের রীত শেষ।

### বাসি বিয়ে : কনের বাড়ি

বরকনে তার পর দিন কনের বাড়ি থেকে যাত্রা করবে। কি কি দেখে যেতে হয়? নারায়ণ, এয়োস্ত্রী, পূর্ণঘট, মাছ, দই, মিষ্টি, এইসব সামনে রাখে। মেয়ের কাছে মা বিদায় দেবার সময় কনক-অঞ্জলি নেন, ছেলের মা যেমন নেন সেই ভাবে। গাড়ি চলে যাবার আগে মা নিজের চুল দিয়ে মেয়ের পা মুছিয়ে দেন। মাকে যাত্রা করা দেখতে নেই। বরকনে চলে গেলে মা এক কলসী জল গাড়ির তলায় ঢেলে দেন।

### বাসি বিয়ে : বরের বাড়ি

বর ও কনে আসবার আগে বরের বাড়িতে একটি পিরিচে করে একটু পান ছেঁচে রাখতে হয়, ও ছোট বাটিতে একটু মধু ও একগাছি সোনার লোহা ঠিক করে রাখে। এক জায়গায় একটি উহুন ঠিক করে তাতে দুধ বসিয়ে রাখে, খুব বেশি ক'রে জল দিয়ে। প্রথম বর কনে এসে দাঁড়ালে বরের মা কনের মুখে মধু পান ও কানে একটু মধু ছুঁইয়ে দেন, লোহা পরিয়ে দেন। তার পর শাশুড়িস্থানীয়ারা সকলেই কনের মুখে পান মধু দেন। এর পর কনে ও বরকে সেই উনানের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। একে বলে দুধ ওথ্‌লাবার জায়গা। কনেকে বলা হয় 'চেয়ে দেখো'—সেই সময় খুব জোরে বাতাস দিয়ে বেশি করে দুধে জল দিয়ে দিলে দুধ উথলে পড়ে, পড়লে বলে 'সুলক্ষণা বউ, শ্বশুরবাড়ির ধনদৌলত উথলে পড়বে।' কনে যখন আসে তার কাঁখে একটি ছোট ঘটি জল ভরে দিতে হয়, এবং দুধ ওথ্‌লানো হয়ে গেলে যখন ভিতরে বরণ হতে যায়, সেই সময় একটি ছোট রেকে ধান ভ'রে তাতে একটি সিঁদুরকৌটো বসিয়ে কনের মাথায় ধরে থাকে, বর সেই ধান জাঁতি দিয়ে কাটতে কাটতে বরণের জায়গায়

যায়। যতদূর যাবে লালপাড় কাপড় পেতে দেয়। বরণের জায়গায় বরের পিঁড়ি ও কনের দাঁড়াবার জন্য একটি শিল উল্টো করে পেতে রাখা হয়, সেই শিলের সামনে একটি কালো পাথরে দুধ ও আলতা গুলে তাতে জীয়ন্ত মাছ ছেড়ে রাখে, সেই শিল ও পিঁড়ির সামনে একটি মাটির ছোট পুকুর গড়ে জল দিয়ে রাখে। বরণ হয় একই প্রথায়। কনে সেই দুধে আলতার পাথরে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে দাঁড়ায়, বরণ শেষ হলে বর ও কনেকে যৌতুক খেলানো হয় সেই ভাঁড় কুলো ইত্যাদি নিয়ে। সেই সময় বর ও কনেকে বরের বাড়ির সকলে গহনা ইত্যাদি দিয়ে আশীর্বাদ করেন। তার পর বর ও কনেকে লালপাড় সুতি ধুতি ও শাড়ি পরতে হয়; তার পর কলতলায় এসে বসে মাঝের মাটির পুকুরে কড়ি লুকোনো হয়। সাতটি কড়ি কনে লুকিয়ে রাখে, বর খুঁজে বার করে। বরের মুখের সামনে কাপড় আড়াল দেয়। তিনবার খেলার পর চারটি পিটুলির পুতুল তৈরি করে রাখে। তেলের বাটিতে একটু ডুবিয়ে বর কনের পিঠে ঠেকিয়ে ফেলে দেয়, কনে বরের পিঠে ঠেকিয়ে ফেলে দেয়। তার পর ঐ লালপাড় শাড়িটি মাথার উপরে ধরতে হয়, বর তার জামাই বরণের আঙটি দিয়ে কনেকে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। বাসি বিবাহের কাজ এইখানে শেষ। এইবার কুশণ্ডিকা, বিয়ের জোড় ও শাড়ি পরে, টোপর সিঁথিমৌর পরে সাজতে হয়। তার পর শাস্ত্রমতে মন্ত্র পড়ে, হোম, সপ্তপদী গমন, খই পোড়ানো, ছেলে কোলে করে তার মুখে মিষ্টি দেওয়া ও সেখানে বর রেকে করে কনেকে ফের সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এসব নারায়ণের সামনে হয়। কুশণ্ডিকা শেষ হলেই বিবাহের যাবতীয় আচার শেষ। তার পর সেইদিন বর ও কনেকে আলাদা রাখে, পরস্পর দেখা হবে না, সেদিন কালরাত্রি।

## ফুলশয্যা

ফুলশয্যার রীত বিশেষ কিছুই নেই। সেইদিন সকালে মেয়ের বাড়ি থেকে এইসব জিনিস পাঠায়— ঘি, ময়দা, চিনি, তেল, মাছ, দই, কাঁচা তরকারি ও ফল কিছু— তার পর বিকেলে তত্ত্ব পাঠায়, যার যেমন অবস্থা সেইভাবে দেয়। কাপড়, খাবার, প্রসাধনের দ্রব্য, ফুল ও ফুলের গহনা, পানমসলা, ঠাট্টার খাবার, মালা ইত্যাদি, এইসব দেয়। সন্ধ্যাবেলা বর-কনেকে মেয়ে-মজলিসে বসিয়ে ভাঁড়কুলো খেলানো হয়। মালাবদল হয়। তার পরদিন বউকে একবার রান্নাঘরে নিয়ে যায়, একটি টাকা দিয়ে বউ ভাতের হাঁড়ি ছুঁয়ে দেয় ও কিছু ভাত ছোট থালায় করে এনে, শ্বশুর-ভাসুর সকলে যখন খেতে বসে, তাঁদের পাতে দেয়। এই হল বৌভাত। ফুলশয্যার দিন বউ যখন ভাত খেতে বসে তখন 'বউয়ের হাতে ভাত দেওয়া' বলে একটা রীত আছে। একটি নূতন শাড়ি, একটি সিঁদুরকৌটা, লোহা একগাছি, একটি টাকা বর বউয়ের হাতে দেয় ও তার ভাতের সাজানো থালাটি হাতে তুলে দেয় ও তিনবার বলে, 'আজ থেকে তোমার ভাতকাপড়ের ভার নিলাম।'

ফুলশয্যার রীত এইখানে শেষ হল। তার পর তিনদিনের দিন বরকনে একবার কনের বাড়ি যায় ও ফিরে আসে— তাকে বলে 'ধুলাপায়ে গমন।' তার পর নয় দিনের দিন জোড় ভাঙা হয়। কনের বাড়ি বর ও কনে যায়, কনের মা বরণ করে ঘরে নেয়, তার পর হাতের সুতো খোলা, শাঁখা শিত্লোন হয়, কালোপাড় কাপড় পরে। সেইদিন গাঁটছড়া খোলে। বর নিজের বাড়ি ফিরে আসে, মেয়ে মায়ের কাছে থাকে, তাকেই বলে জোড়-ভাঙা। আটদিন দাঁড়িসিঁদুর সিঁথিতে রাখতে হয়, সেইদিন দাঁড়ি-সিঁদুর বাড়ন্ত করে অল্প করে ছোট করে সিঁদুর পরে। এক বছর বাদে

ভাঁড়কুলো, টোপরমুকুট জলে দেয়— আর আটদিন বাদে শুভদৃষ্টির ফুলমালা ও গাঁটছড়া খোলার জিনিস, কলাগাছ চারটি ও তেলহলুদ যা থাকে সব জলে ফেলে দেয়। এই হল স্ত্রী-আচারের নিয়ম আমাদের ঠাকুর পরিবারের।

শ্রীমাধবী ভট্টাচার্য

২

## উত্তরবঙ্গ

### গাত্রহরিদ্রা

শুভদিন দেখে সোয়াকাঠা লাল ধান, সোয়া সের হলুদ, পাঁচটি পান, পাঁচটি সুপারি দিয়ে ঢেঁকিকে বরণ করে পূজা করতে হয়। তার পর পাঁচ এয়ো মিলে, ঐ হলুদ ঢেঁকিতে কুটবে— তখন শাঁখ বাজবে, উলু দেবে। হলুদ গুঁড়ো হলে তুলে নিয়ে ধানকেও চাল করতে হবে। এই চাল দিয়ে পরে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, বিয়ের আলপনা ইত্যাদি কাজ করা হয়।

এই হলুদ মেয়ে অথবা ছেলের গায়ে দেবার সময় পাঁচজন সধবা বা এয়ো মিলে দেবে। এয়োরা সবাই লালপাড় কাপড় পরবে, তাদের মুখে একটি পান ও আস্ত একটি সুপারি ও কিছু মিষ্টি মুখে রাখতে হয়। কনেকে ঘরের ছেঁচতলায় আটখানা কুলোর উপর বসাবে, তার পরনে নূতন লালপাড় কাপড় থাকবে। কনের মুখে দুটো সুপারি, বুকে পিঠে

পান। কাঁচা দুধ, জড়ানো কলার পাতা ও একটি ছুরি হাতে কনের ভাই ঐ ঘরের চালের কোণা থেকে দুধটা মেয়ের মাথায় ধীরে ধীরে ঢেলে দেবে। তার পর পাঁচ এয়োতে মিলে কনেকে হলুদ দিয়ে স্নান করাবে। স্নানের শেষে ঐ কলাপাতা জড়ানো, ছুরি ও একটি জোড়া-প্রদীপের বাটি নিয়ে কনে ঘরে গিয়ে একটি নূতন শীতলপাটিতে বসবে। একটা নূতন লাল হাঁড়ি ও তার ঢাকা চাই। ঐ হাঁড়িতে এক হাঁড়ি জল পাঁচ এয়োতে ভরে নিয়ে এসে কনের সামনে রাখবে, তখন কনে একটি ছোট মাটির খুরি দিয়ে ঐ জল মাপবে ও মনে মনে বলবে, 'শিব যেমন শিবানীর সোহাগ পেয়েছিলেন, আমি যেন সেই রকম পতিসোহাগিনী হতে পারি। আমি শাশুড়ির সোহাগ যেন পাই, দেবরের শ্রদ্ধা যেন পাই, আমি সর্বান্তঃকরণে যেন তাঁদের উপযুক্ত হতে পারি।' এই কথার সঙ্গে সঙ্গে জল খুরিতে করে তুলবে আর ঐ হাঁড়িতেই ঢেলে দেবে। এই নিয়মটিকে আমাদের দেশে "সোহাগ মাপা" বলে। বলা বাহুল্য, কনে সেদিন উপবাসী থাকবে। দুপুরে কনের বাবা অথবা ভাই বা কোনো নিকট আত্মীয় নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করবেন।

সন্ধ্যার কিছু আগে পাঁচ এয়োতে মিলে বরণডালা,[১] একটি গাড়ু— তাতে আমের পল্লব দেওয়া, একটি পাখা ও একটি নূতন মাটির কলসী নিয়ে নদী অথবা পুকুরের ঘাটে যাবে। সেখানে গিয়ে জলকে বরণ করে পূজা করবে, তার পর দুটি প্রদীপ জ্বেলে জলে ভাসিয়ে দেবে, একটি কনের নামে ও একটি বরের নামে। প্রদীপ দুটি ভাসতে ভাসতে যদি এসে মিলে যায় তবে খুব সুলক্ষণ মনে করে এয়োরা হাসিমুখে ঘরে ফিরবেন। আর

১ বরণডালার উপকরণ— এক ছড়া পাকা কলা, ধান, তিল, যব, মাসকলাই, শ্বেত সরিষা, দূর্বা, পাঁচটি প্রদীপ।

যদি একটি প্রদীপ জলে ডুবে যায় তাহলে অমঙ্গল, এয়োরা জলভরা চোখে বাড়ি আসবে। সঙ্গে যে মাটির নূতন কলসী আছে, তাতে পাঁচ এয়োতে মিলে জল ভরে বাড়ি ফিরবে। ঐ জল ছাদ্‌নাতলায় রাখা হবে। তার পর যত স্বামীসোহাগিনীরা আছেন তাঁদের কোল-আঁচল ঐ কলসীতে ডোবাতে হবে। ঐ জল পরের দিন বাসি বিয়ের সময় কনে-জামাইকে স্নান করানোর জন্য লাগবে।

## বিবাহ

সন্ধ্যা হয়ে এলে বর আসবে।

বর বাড়িতে এলে কনের মা, ঠাকুমা, জ্যাঠাইমা এঁরা সবাই বরের ডান হাত দুধ দিয়ে ধোয়াবেন, ঘিয়ের প্রদীপ জেলে বরের মুখ দেখবেন। তার পর বরের গলার পৈতে ও বরের পরনের কাপড় পরিবর্তন করিয়ে ঐ ছাড়া কাপড় নিয়ে ভিতরে আসবে। একটি বড় পিঁড়িতে ঐ কাপড় বিছিয়ে দেবে ও ঐ পৈতে কনের বাঁ পায়ে বেঁধে দেবে। তার পর কনে সাজানো হলে তাকে ঐ পিঁড়িতে বসিয়ে গৌরীপূজা[২] করতে বসাবে। গৌরীপূজার সময় এ দিকে বরকে নিয়ে স্ত্রী-আচার হবে। বরকে উঠোনের মধ্যে দাঁড় করাবে, তার পর জোড় এয়োতে[৩] মিলে একটি পাঁচহাত প্রমাণ পাটকাঠি দিয়ে বরকে মাপবে। হাত, পা, পিঠ, বুক, লম্বা চওড়া মাপতে

২ গৌরীপূজার উপকরণ— আটটি মাটির খুব ছোট হাঁড়ি মুড়কি দিয়ে ভরা থাকবে। হাঁড়ির মুখের ঢাকার উপর পান, সন্দেশ, সুপারি, ছোট আয়না, চিরুনি, সিঁদুরকৌটো থাকবে।

৩ পাঁচ এয়োর মধ্যে দুজন জোড় এয়ো থাকেন, তাঁদের পরস্পরের আঁচল গিঁট বাঁধা থাকে, তাঁরাই সব পরিচালনা করেন। এঁরা হেড এয়ো আর-কি।

হয়। মাপা হলে ঐ কাঠিটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। ঐ আগুনের তাপ নিয়ে দুই জোড়-এয়ো বরকে বুকে পিঠে তাপ দেবে। বরের দুই কান সুতো দিয়ে বাঁধবে, দুই হাত বাঁধবে, হাতে পাঁচটা পান সুপারি ও একটি টাকা দেবে, তার পর শাশুড়ি হাতে একটি মাকু দিয়ে বলবেন—

"হাতে দিলাম মাকু,
ভ্যাঁ করো তো বাপু।"

বরের হাত বাঁধাই থাকবে, শাশুড়ি বরের পিছনে গিয়ে চুল আঁচড়ে দেবে, তার পর পিছনেই আঁচল পাতবে। তখন বরের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে তার হাতে যে পান সুপারি ও টাকা আছে, তা সব পিছনে হাত করে শাশুড়ির আঁচলে ঢেলে দেবে। একেই আমাদের দেশে কনক-অঞ্জলি বলে। এবার বরকে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাবে। বরকে দাঁড় করিয়ে একটি পাতলা উড়ুনি দিয়ে চোখটা ঢেকে দেবে। কনেকে একটি পিঁড়িতে করে বয়ে আনবে ও সাতপাক ঘোরাবে। আমাদের দেশে কনের মুখ পান দিয়ে আড়াল করা থাকে না, বরের চোখই উড়ুনিতে ঢাকা থাকে। সাত পাক ঘোরা হলে একটি স্বচ্ছ কাপড় দিয়ে বরকনেকে ঢেকে দেবে। ঐ কাপড়ের চারি দিকে এয়োরা পুষ্পবৃষ্টি করবে, শাঁখ বাজাবে, তখন বরের চোখ খুলে দেবে, পরস্পর শুভদৃষ্টি হয়ে মালাবদল হবে। এর পর সম্প্রদান। কন্যাদান হয়ে গেলে বরকনেকে বাসরঘরে নিয়ে যাবে। বাসরে যাবার পথে একটা নূতন কাপড় ঘরের দরজার সামনে লম্বা করে পাতা থাকবে। তার উপর পর পর চারটি প্রদীপ উল্টো করে তার মধ্যে চারটি করে কড়ি দিয়ে সাজানো থাকবে। এয়োরা আগে আগে জলের ছড়া দিতে দিতে যাবে,

তার পরে বর নিজের কড়ে আঙুল দিয়ে কনের কড়ে আঙুল ধরে এগোবে। প্রথমে বর ডান পা দিয়ে ছুটো প্রদীপ ভেঙে চলে যাবে, তার পর কনে অন্য ছুটি বাঁ পা দিয়ে ভেঙে চলে যাবে। উভয়ের গাঁটছড়া বাঁধা থাকবে বলা বাহুল্য।

বাসরে বসলে পরে, যাঁর সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্ক তাঁরা ধীরে ধীরে এসে জুটবেন। তখন কড়ি খেলা হবে। আর-একটি মজার খেলা আছে, তাকে বলে 'গোসা ভাঙা খেলা'। বর আগে যাবে, কনে তখন তাকে বই কলম দোয়াত দিয়ে হাত ধরে বলবে, 'রাগ কোরো না, ঘরে এসো, লেখাপড়া করে আমাকে নিয়ে স্থখে সংসার করো।' আবার কনে চলে যাবে, তখন বর একটা থালায় শাঁখা সিঁছুর শাড়ি গহনা দিয়ে হাত ধরে বলবে, 'রাগ কোরো না, ঘরে এসো, শাঁখা সিঁছুর পরো, আমাকে নিয়ে স্থখে ঘর করো।' পরস্পর মুখে মিষ্টি দেবে, পান দেবে, তার পর বিশ্রাম।

বিয়ের রাতে আমাদের দেশে বর ভাত খায় না। ফল, মিষ্টি, লুচি, তরকারি ইত্যাদি খায়, কনে ভাত খায়।

বাসরে বরকনে একলা থাকে না। একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে। যাদের সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্ক তাঁরা সারারাত গান গল্প ঠাট্টা ইত্যাদিতে স্থখে নিশিযাপন করেন।

প্রভাতে পাঁচ এয়োতে বরকনের শয্যা তুলবে। বিছানায় বরকনে বসে থাকবে; ছদিক থেকে ছজন এয়ো তাদের মাথার উপরে একটা কাপড় ধরবে; তার উপর খই, পাঁচটা স্থপারি, পাঁচটা কড়ি, পাঁচটা পয়সা দিয়ে পাঁচ এয়োতে সেটা ছুলিয়ে দেবে। এটা হয়ে গেলে বরের হাতের উপর কনের হাত রেখে একটা ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেবে, তখন ডাক পড়বে বরকর্তার। তিনি এলে এয়োরা বলবে, 'টাকা না দিলে বাঁধন

খুলব না, শয্যাও তুলব না।' তখন যার যেমন সাধ্য টাকা দিয়ে বরকে মুক্ত করেন। এই টাকা এয়োদের প্রাপ্য, একে শয্যাতুলুনি বলে।

আগের রাত্রের সেই-যে গৌরীপূজার হাঁড়িগুলি খই-মিষ্টিতে ভরা আছে, আটটি কুমারী মেয়ে ডেকে কনে সেগুলি এখন বিলিয়ে দেবে।

### বাসি বিয়ে

এবার বাসি বিয়ের আয়োজন। বিয়ের দিন সন্ধ্যায় এয়োরা যে এক কলসী জল এনে সব স্বামীসোহাগিনীদের আঁচল ধুয়ে রেখেছিলেন, এবার সেই জল দিয়ে ছাঁদনাতলায় ছোট্ট পুকুরের আকারে একটি গর্ত হবে। পুকুরের এক দিকে একটি শিল পাতা থাকবে। বরকনে ঐ শিলের উপর দাঁড়াবে। পুকুরের চারি দিকে সাতটি পান, পানের উপর সাতটি কলা ও সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া থাকবে। এর পর, ঐ কলসীর জল যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাই দিয়ে বরকনেকে স্নান করানো হবে। প্রথমে বরের মাথায় পাঁচ এয়োতে জল ঢেলে দেবে, বরের মাথা দিয়ে গড়িয়ে এসে তা কনের মাথায় পড়বে, একে বলে সোহাগ জলের স্নান। স্নানের পরে পুকুরপাড়ের ঐ সাতটি পান সাতবার কুড়িয়ে কনের আঁচলে দেবে এবং ঐ পানের সিঁদুর বরের হাতের আঙটি দিয়ে বর কনের সিঁথিতে সাতবার পরিয়ে দেবে। সব মিটে গেলে বরকনে হোম করতে বসবে। হোমের শেষে লাজ-অঞ্জলি দিয়ে সপ্তপদী গমন এবং কন্যার গোত্রান্তর সাধন হয়ে যাবে। কন্যার বাড়ির বিবাহ-অনুষ্ঠান এইখানেই একরকম শেষ।

দুপুরে জামাই যখন খেতে বসবে তখন শাশুড়ি নূতন কাপড় পরে ভাত দেবেন। জামাইকে যে পাত্রে খেতে দেবে সেসব নূতন পাত্র হওয়া চাই। জামাইয়ের খাওয়া হলে, ঐ পাতে কন্যা প্রসাদ পাবে।

কন্যার আহারের শেষে, বরের সঙ্গে যে চাকর থাকবে সে ঐ সমুদয় বাসন পাবে এবং শাশুড়ি যে নূতন শাড়ি পরে ভাত দিলেন সে শাড়িও পাবে। আজকাল অবশ্য সবই মূল্য ধরে দিয়ে মুক্তি পাওয়া যায়। বিকেলে কন্যা-যাত্রার সময় বরকনেকে সাজিয়ে একটি শীতলপাটির উপর বসিয়ে বাড়ির সব গুরুজনেরা ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন, ছোটরা এসে প্রণাম করে। আশীর্বাদের পর ছাঁদনাতলায় দাঁড় করিয়ে বরণ করা হয়; শেষে এক মুঠো ধান, ইঁদুরের গর্তের এক মুঠো মাটি ও একটিমাত্র টাকা, কনে বাবার কোঁচড়ে ঢেলে দিয়ে বলে, 'এতদিন যা খেয়েছি পরেছি, আজ তা সব শোধ করে দিলাম।'

মেয়ে বাড়ি থেকে যাবার সময় মাকে দেখতে পায় না। মা তখন মেয়ের কল্যাণের জন্য সেই সোহাগ-জলের হাঁড়ি কোলে নিয়ে মেয়ের সোহাগ মেপে চলেছে— 'আমার মেয়ে যেন স্বামীর সোহাগ পায়, শাশুড়ির সোহাগ পায়, সমস্ত শ্বশুরকুলের সোহাগ পায়।'

আমাদের দেশে তত্ত্বের ঘটা নেই। যদি কাছাকাছি বিয়ে হয় তবে ভালো একটি শাড়ি, মাছ, দই, মিষ্টি, বরের ধুতি, পান সুপারি ফুল ইত্যাদি সামান্য উপকরণ নিয়ে মেয়ের বাড়ির একজন বরের বাড়ি যান মেয়েকে দেখতে। আর যদি দূরে বিয়ে হয় তাহলে এইসব জিনিসের জন্য কিছু মূল্য দিয়ে দেওয়া হয়; সে অতি সামান্য, প্রায় রীত রক্ষার মতো।

যত দূরেই বিয়ে হোক-না কেন, বিয়ের সাতদিন পর মেয়ে-জামাইকে আসতেই হয়, একে আমাদের দেশে বলে জোড় ভাঙতে যাওয়া।

শ্রীকমলা বিশী
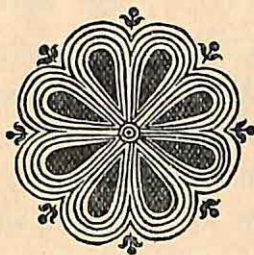
৩

# পূর্ববঙ্গ

## মঙ্গলাচরণ

হিন্দু বিবাহের মঙ্গল-আচার দশদিন আগে শুরু করতে হয়। প্রথম দিন হলুদ কোটা ও বৃদ্ধির ধান ভানার নিয়ম। বৃদ্ধির ধান ভানবার সময় আত্মীয় বন্ধু ও পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের তেলসিঁদুর পানসুপারি ও মিষ্টি দিতে হয়। বিয়ের প্রতি আচার বা কাজ অন্তত পাঁচজন এয়োস্ত্রী মিলে করবার নিয়ম, বেশি হলে ক্ষতি নেই। আগে এই দিন থেকে প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েদের মঙ্গলগীত গাইবার নিয়ম ছিল। বিয়ের জন্য এই সময় কুলো, পিঁড়ি, হাঁড়ি, কলসী, ঘট, সরা প্রভৃতি যেসব জিনিস বিয়ের কাজে লাগে তা চিত্রিত করে রাখতে হয়। এই কাজ বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ দুই বাড়িতেই এক ভাবে করতে হবে। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ( পিতৃপুরুষকে জলদান ) দুই বাড়িতেই এক নিয়মে করে।

### অধিবাস

বিয়ের আগের দিন অধিবাস। বরের বাড়ি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও অধিবাসের পুজো হয়ে গেলে, নতুন থালার উপরে নতুন বাটিতে রাখা চন্দন পুরোহিত বরের কপালে লাগিয়ে দেন। সেই চন্দনের থালাবাটি কনের বাড়িতে পাঠাতে হয়। কনের বাড়িতে ঐ ভাবে অধিবাসের পূজা হয়ে গেলে ঐ চন্দন মেয়ের কপালে লাগিয়ে দেওয়ার নিয়ম। বরের বাড়ি থেকে ঐ চন্দন, অধিবাসের জন্যে শাড়ি গয়না তেল ও নানা প্রসাধন সামগ্রী যে যার ইচ্ছামতো পাঠাবে। তবে ঐ সঙ্গে একটি সোনার মাহুলি, লম্বা একটি সিঁদুরের কৌটো, সিঁদুর, পান, মাছ, দই, ক্ষীর, মিষ্টি ইত্যাদি পাঁচ ভাড় অবশ্য দিতে হবে। ও আগে একুশ হাঁড়ি দেওয়ার নিয়ম ছিল। তখন ঘরে তৈরি নারিকেল ও ক্ষীরের নানা রকম মিষ্টান্ন তৈরি করে দেওয়া হত ; মজা করার জন্য ময়দা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি নানা অখাদ্য জিনিসেও দু-এক হাঁড়ি ভরে দিত।

মেয়ের বাড়িতে এই তত্ত্ব ও চন্দন পৌঁছলে মেয়েকে তেল হলুদ মাখিয়ে এয়োস্ত্রীরা মিলে স্নান করান। স্নানের পরে বরের বাড়ি থেকে পাঠানো শাড়ি ও বাপের বাড়ির দেওয়া সব গয়না পরিয়ে, সাজিয়ে, অধিবাসের পূজা হয়ে গেলে বরের বাড়ির থেকে পাঠানো চন্দন কপালে লাগিয়ে দেয়। সোনার মাহুলিও পরিয়ে দেয়। ঐ শাড়ি বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পরে থাকতে হয়।

### নিদ্রাকলসীতে জল ভরা

বিয়ের দিন উষালগ্নে নিদ্রাকলসের জল ভরতে হয়। এয়োস্ত্রী ও ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে কলসীতে জল ভরতে যায়। স্বামীস্ত্রীর একসঙ্গে

কাপড়ে গাঁঠ বেঁধে এই জল আনবার নিয়ম। স্বামীর হাতে একটি খাঁড়া থাকে, তা দিয়ে জল কেটে দিতে হয়। এবং সে কাটা জায়গার জলই কলসীতে ভরতে হয়। কলসীর উপর একটা নতুন গামছা ও কলা, আমের পল্লব ও নারকেল দিতে হয়। এই কলসী যে ঘরে যেখানে রাখা হয় সেখানেই বরকনেকে বিয়ের আগে ও পরে বসাবার নিয়ম। এইসব স্ত্রী-আচারের সময় সর্বদা হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করতে হয়, বাজনা থাকলে তাও বাজায়।

### দধিমঙ্গল

নিদ্রাকলসীতে জল ভরার পরে, ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে বর ও কনেকে দই চিঁড়া মিষ্টি ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। ছোটভাই বন্ধুদের নিয়ে সকলে হৈ চৈ করে খায় ও আনন্দ করে। বিয়ের দিন দুধ দই মিষ্টি ফল ছাড়া আর কিছু খাওয়ার নিয়ম নেই।

### বরযাত্রা

বিয়ের দিন যাত্রা করার আগে বরকে নতুন কাপড় পরিয়ে তেল হলুদ ছুঁইয়ে এয়োস্ত্রীরা নতুন মাটির কলসীতে জল ভরে পাঁচজনে ধরে সেই জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেয়। স্নানের পরে ঘরে একটি মাদুরের উপরে বরকে বসিয়ে চারজন এয়ো চার কোণায় দাঁড়িয়ে সাত পাক সুতো ঘুরিয়ে নিয়ে তা পাকিয়ে হল্‌দে রঙ করে পাঁচটি দূর্বা বেঁধে ডান হাতে বেঁধে দেয়। যাত্রা করার আগে মা ছেলের হাত কনুই পর্যন্ত দুধ দিয়ে ধুইয়ে দেন।

বিয়ের দিন মেয়ের বাড়িতে বিয়ের আসর। দরজায় মঙ্গলঘট ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়। মেয়ে সারাদিন এক হাঁড়ি জলে সেচ দিয়ে স্বামী, শ্বশুর,

শাশুড়ি দেবর ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে 'সোহাগ' মাগে। বিয়ের সাজে সাজবার আগে, মা-কাকির সঙ্গে গিয়ে পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনদের ছুয়ারে ছুয়ারে গিয়ে সোহাগ ভিক্ষা করে। সন্ধ্যার আগে পিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে হলুদ তেল ইত্যাদি মাখিয়ে এয়োস্ত্রীরা হুলু, শঙ্খ ও বাদ্য -ধ্বনির মধ্যে স্নান করায়। পরে ঘরে এনে চিত্র-করা পিঁড়ির উপর বসিয়ে, মাথার উপর দিয়ে সাত পাক সুতো ঘুরিয়ে পাকিয়ে নিয়ে ও হলুদে রঙ করে দূর্বা দিয়ে বাঁ হাতে সে সুতো বেঁধে দেয়। একটা গামছা ধরে তাতে পাঁচমুঠো চাল ( ⁄১৹ ) পাঁচটা পান ও সুপারি দিতে হয়। পরে ঐ চাল দিয়ে বর কনে খেলা করে।

এর পর মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজাতে হয়। বরযাত্রী দরজার কাছে এলে মেয়েরা কনেকে গঙ্গাপূজা করাতে ঘাটে নিয়ে যায়। বরকে সভায় এনে অর্ঘ্য বস্ত্র দান করা হলে বরকে সাজিয়ে ঘরে এনে নিদ্রাকলসীর সঙ্গে সুতো দিয়ে বেঁধে স্ত্রী-আচার করে মেয়েকে সভায় নিয়ে যাওয়া হয়। বরকে স্ত্রী-আচারের পরে সভাতে নিয়ে এসে সাতপাক ঘোরানো, মালাবদল ও শুভদৃষ্টি করানো হয়। শুভদৃষ্টির পরে বর ও কনেকে চিত্র-করা পিঁড়িতে ছুই দিকে বসিয়ে, আলপনার উপরে স্থাপিত ঘটের কাছে বরের হাতের উপরে কন্যার হাত মালা দিয়ে, বেঁধে দিয়ে পুরোহিত কন্যার বাবা, জ্যাঠা বা ভাইদের দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়ে কন্যাদান করান। এ সময় গোত্রান্তর, যজ্ঞ ও সপ্তপদী ইত্যাদি করানো হয়। এই অনুষ্ঠান শেষ হলে বর-কনেকে ঘরে এনে স্ত্রী-আচার বরণ ইত্যাদি করা হয়। তার পরে বর-ভোজন করিয়ে বাসরশয্যায় পাঠানো হয়। বরভোজন নামেই হয়, বিয়ের রাত্রে বর শ্বশুরবাড়ির কিছুই খায় না। পাঁচ গ্রাস ভাত শুঁকে ফেলে দেয়। শাশুড়ি সেই ভাত আঁচল পেতে নেন। অবশিষ্ট ভাত কনে

খায়। এই আঁচল পেতে ভাত নেওয়ার জন্যে মেয়ের মাকে বরের বাড়ি থেকে শাড়ি দিতে হয়।

বিয়ের পর দিন ভোরবেলা বাসরশয্যাতে উঠে বর ও কনে দুজনে দুজনকে দুধ দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেয়। তার পর দুপুরে উঠানে চারি দিকে কলাগাছ পুঁতে একটা জায়গা করা হয়। তার মাঝখানে ছোট একটা গর্ত বা পুকুর করে। বরকনেকে একসঙ্গে তেল হলুদে স্নান করানো হলে ঐ পুকুরে আঙটি লুকোনো আর বের করার খেলা হয়। তার পর ঘরে এনে বরকনেকে সিঁদুর পরায়। বরের হাতে এ সময় একটা দর্পণ সর্বদা থাকে, বর তা দিয়ে অথবা আঙটি দিয়ে মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে দেয়। তার পর চাল সুপারি পান দিয়ে খেলা, বরণডালার প্রদীপ ঢেকে দেওয়া আর খোলা, ও নানা খেলা হয়। বলা বাহুল্য সব খেলাতে কন্যাই জয়ী হয়। তার পরে কন্যাবিদায়ের পালা। এতদিনের বন্ধন সব ছিঁড়ে নতুন পথের যাত্রা যে কত করুণ, এই উৎসবের পরে ভুক্তভোগীরাই জানে।

এবার আনন্দের পালা বরের বাড়িতে। তারা ঘর আঙিনা জুড়ে আলপনা দেয়, বরণডালা সাজিয়ে রাখে বধূবরণের জন্যে। আলপনার মাঝখানে পাথরের মধ্যে দুধ আলতা মিশিয়ে তার উপর আস্ত পান পেতে রাখে; বধূ এসে তার উপরে দাঁড়ায়। ছোট রেকাবে ছোট ছোট সন্দেশ মধু নিয়ে শাশুড়ি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে বধূর মুখ দেখে সেই মিষ্টি ও মধু বধূকে খাইয়ে দেন, কানেও মধু দেন— কথা নাকি মিষ্টি শুনবে। তার পর বরবধূকে একত্র বসিয়ে সকলে আশীর্বাদ করে, বরডালা এয়োরা ছোঁয়ায়, বরণ করে, খেলা করায়, শাশুড়ি হাতের লোহা পরিয়ে দেন। পরদিন পাকস্পর্শ ও বৌভাত। রাত্রিতে ফুলশয্যা। পাকস্পর্শে নববধূ

বাপের বাড়ির দেওয়া চন্দন-কাঠ উনুনে দেয়— রান্নার কাজে একটু নাড়া দিয়ে আসে। ভাণ্ডারে হাত দেয়, এবং পরে শ্বশুর, ভাসুর, জ্ঞাতিগোত্রদের পরিবেশন করে। এই দিন পঞ্চপদ ভাত, দই মিষ্টি ইত্যাদি নানা খাদ্যে পরিপূর্ণ থালার উপরে নতুন শাড়ি দিয়ে বর সেই ভাত ও কাপড় বৌয়ের হাতে দেয়— এবং সমস্ত জীবন এই ভাবে তার ভরণ পোষণ করবে সেই অঙ্গীকার করে।

এর পরে দ্বিরাগমন— দশ দিনের মধ্যে দু বাড়ি দুবার যাওয়া আসা করে। তার পর চার দিন অথবা দশদিনে গ্রন্থিমোচন করে। বিয়ের সময় পুরোহিত আঁচলে যে পাঁচটি হরতকি বেঁধে দুজনের আঁচলে গিঁঠ দেয় তা এবং হাতের সুতো খুলে জলে ফেলে দেয়। একে চতুর্থ মঙ্গল বা দশমঙ্গল বলে।

শ্রীশৈবলিনী সেন
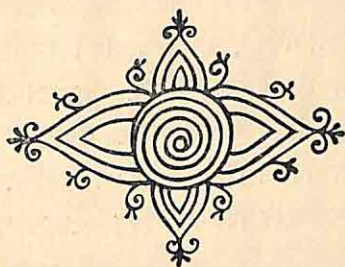
৪

# পূর্ববঙ্গ

## মঙ্গলাচরণ

বর ও কন্যা-পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর যখন কোনো পক্ষে আর অমতের কারণ থাকে না তখন বরের বাড়ি থেকে একজন পুরোহিত, একজন অভিভাবক ও একজন চাকর সঙ্গে নিয়ে মেয়ের বাড়িতে আশীর্বাদ করতে যান। এই অনুষ্ঠানকে বলে মঙ্গলাচরণ। আগে ঐ অঞ্চলে সাধারণত মেয়ে দেখাবার নিয়ম ছিল না। একবার মেয়ে দেখে বরপক্ষ অপছন্দ করে ফিরে গেলে দুর্নাম হয়। এখন আর এই প্রশ্নই ওঠে না— কোনো মেয়েই আর ঘরে আবদ্ধ থাকে না। স্কুল-কলেজের পথেই অনেক সময় অভিভাবকদের মেয়ে দেখা হয়ে যায়।

মঙ্গলাচরণের খরচটা বর পক্ষের। প্রথমে বাড়ির বিগ্রহের প্রণামী এবং যে পণ্ডিত বিবাহের দিন-ক্ষণ-লগ্ন স্থির করবেন তাঁর প্রণামী দিতে

হয়, যার যার অবস্থানুযায়ী। মেয়ের বাড়িতে উপস্থিত সকলকে পান ও মিষ্টি দিতে হয়। বরকর্তা একটি সোনার গহনা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। একখানা শাড়ি ও শাঁখাসিঁদূর পূর্বে এই দেবার নিয়ম ছিল, এখন আবার প্রসাধনদ্রব্যও দেওয়া হয়ে থাকে। বাইরে প্রাঙ্গণে যেখানে বরপক্ষকে নিয়ে সকলে বসবেন, সেখানে আলপনা দিয়ে একটি মঙ্গলঘট বসানো হয়, চিত্র-করা ছোট একখানা পিঁড়ির উপর পঞ্জিকা রাখা হয়। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা পঞ্জিকা দেখে বিয়ের দিন-লগ্ন স্থির করেন। ভিতরে আলপনা দেওয়া স্থানে চিত্র-করা পিঁড়িতে মেয়েকে সাজিয়ে বসানো হয়। মঙ্গলঘট প্রদীপ ইত্যাদি দেওয়া হয়। তখন বরকর্তা এসে আশীর্বাদ করেন। বরকর্তার সঙ্গী পুরোহিতকে মর্যাদাস্বরূপ দক্ষিণা ও ভৃত্যকে পারিতোষিক কন্যাকর্তা দেন। সকলে মিষ্টিমুখ করে বাড়ি যান।

### পানখিলি

মঙ্গলাচরণের পর ভালো দিন দেখে আগে বরের বাড়িতে পানখিলি হয়ে গেলে পর মেয়ের বাড়িতে পানখিলি দেওয়া হয়। এই পানখিলি-প্রথা পূর্ববঙ্গে সব জেলাতে নেই। কোনো দেশে হলুদ কোটা হয়। কিন্তু বিবাহের দিন যে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ হয় তার আতপ চাল ঘরে সধবাদের নিজে তৈরি করার নিয়ম ছিল। তাকে বৃদ্ধির বাড়া বলা হয়। সাধারণত পানখিলির দিনই সব সধবারা মিলে এই চাল তৈরি করেন। এখন পানখিলির কথাটা বলি। একখানা পিতল অথবা কাঠের থালায় আস্ত পান গোছা করে চার দিকে ঘুরিয়ে সাজানো হয়। মাঝখানে আস্ত সুপারি ও জাঁতি রাখা হয়। ছোট ছোট বাটিতে তেল, দই, সিঁদুরগোলা, চিনি, বাতাসা, ধানদূর্বা সব রাখা হবে। পাঁচটি কি সাতটি সোনা ও রুপোর

খড়কে, ঠিক আলপিনের মতো, পূর্বেই স্বর্ণকারের বাড়ি থেকে তৈরি করিয়ে আনতে হয়। প্রথমে পুরোহিত এসে সোনা-রুপোর খড়কে দিয়ে পাঁচটি পান একত্র করে খিলি দেবেন। এই ভাবে পাঁচটি, সাতটি, কি ন'টি খিলি হয়ে গেলে, সধবা মহিলারা বাকি সব পান বাঁশের খড়কে দিয়ে খিলি দেবেন। খিলিপানের উপর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে সধবাদের হাতে হাতে ঐ খিলিপান বিতরণ করা হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে বাতাসা দেওয়া হয়ে থাকে। তার পর একখানা থালাতে সোনা-রুপোর খিলি-দেওয়া পানগুলি সাজিয়ে একখানা রঙিন গামছায় ঢেকে বর অথবা কনের মাতৃস্থানীয়া একজন ঐ থালা মাথায় নিয়ে দেবালয়ে গিয়ে দিয়ে আসবেন। বলা বাহুল্য যে পানখিলির দিন বিয়েবাড়ি গানবাজনা হুলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। পান দিয়ে দেবতাদের নিমন্ত্রণ করা হল। এ সময় মেয়েরা যেসব গান করেন তাতে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করে বিয়েতে আসবার জন্য তাঁদের সবিনয়ে আহ্বান করা হয়। পানখিলির দিন থেকে বিয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত প্রতি রাত্রেই মহিলারা উৎসবের গান করে থাকেন।

## অধিবাস

বিবাহের পূর্বদিন অধিবাস। ঐ দিন বরকর্তা কন্যাকর্তা উভয়েই সংযম করবেন, অর্থাৎ এক বেলা নিরামিষ খেয়ে রাত্রে দুধ ফল খেয়ে থাকবেন। বিবাহের দিন প্রাতে স্নান করে নান্দীমুখকার্য শেষ হলে বরের পিতা ভাত খেতে পারেন। কন্যা সম্প্রদান না করা পর্যন্ত কন্যা-কর্তাকে উপবাস করে থাকতে হয়। মহিলারা ন'টি চিত্র-করা মাটির ঘটে আম্রপল্লব দিয়ে পুকুর থেকে জল এনে গীতবাদ্য হুলুধ্বনি দিয়ে বরকনেকে

স্নান করাবেন। স্নানের পর কনেকে নতুন শাঁখা, নতুন শাড়ি পরাবেন। সন্ধ্যার পর আবার সাতটি পুকুর থেকে জল আনবেন। একে 'সাত ঘাটের জল ভরা' বলে। রাত্রে স্নানের সময় গায়ে হলুদবাঁটা দেবেন। পশ্চিমবঙ্গের মতো গায়েহলুদের তত্ত্ব বরের বাড়ি থেকে আসে না। এর পরিবর্তে অধিবাসের তত্ত্ব বরের বাড়ি থেকে আসবার নিয়ম ছিল। এখন বিয়ের দিনই বরের সঙ্গে অধিবাসের তত্ত্ব আসে। সাত ঘাটে জল ভরবার সময় গঙ্গাকে তেল সিঁদুর, পানের খিলি ও খৈ দিয়ে, অর্থাৎ জলে ভাসিয়ে, তার পর জল ভরতে হয়। ঘরের মেঝেতে খুব বড় আলপনা দেওয়া হয়। ঐ আলপনাতে মেথিগাছ ও সুন্দা গাছ আঁকতে হয়। সুন্দা কি জানি না, বেনে দোকান থেকে একটি শিকড় আনা হয়। ঐ সুন্দা ও মেথি খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে রাখা হয়। আলপনা হয়ে গেলে ঐখানে একটি পাটি বিছিয়ে বর কি কনের মা পাঁচজন সধবা মিলে একটি ছোট শিল দিয়ে তেল মিশিয়ে ঐ সুঁদামেথি চন্দনপাটায় বাঁটেন। একখানা ওড়না দিয়ে তাঁদের মাথা ঢেকে দেওয়া হয়। তখন তাঁরা মৌনী থাকেন। বাঁটা হয়ে গেলে একটি ছোট কৌটায় তুলে রাখেন। বর ও কনেকে সাজিয়ে ঐখানে একখানা আসনে বসানো হলে পুরোহিত এসে ঐ কৌটা থেকে একটি ফোঁটা কপালে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। একেই অধিবাস বলে। মহিলারা সারা রাত ধরেই গান করেন।

অন্ধকার থাকতে কাক ডাকবার আগে আবার জল ভরে আনা হয়। একে চোরজল বলে।

মেয়ের বাড়িতে সোহাগ সাওয়া হয়। মেয়ের মা অথবা মাতৃস্থানীয়া কেউ শাড়ি-ওড়নায় ঘোমটা দিয়ে, যে চিত্র-করা কুলোয় নানা মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজানো রয়েছে তা মাথায় তুলে নেন। কুলোর উপরে একটি

ঘৃতের প্রদীপ জ্বলতে থাকে। প্রথমে দেবালয়ে ও পরে জ্ঞাতি ও প্রতিবেশী কয়েক বাড়িতে গিয়ে সোহাগ মেগে আনে। অতি সামান্য জিনিস। একমুঠো চাল, একটু তেল সিঁদুর, একটি ফল, দু-চারখানা বাতাসা। বাড়িতে এসে মাথা থেকে কুলো নামিয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে বসবেন, মেয়ের মুখে একটু মিষ্টি দিবেন।

বরের বাড়িতে সোহাগ সাওয়া হয় না। বরের মাকে তেল সাইতে হয়, কুলা মাথায় নিতে হয় না, বাটিতে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তেল এনে একটি মাটির ভাঁড়ে তেল ফুটিয়ে ঐ তেলে সুন্দা-মেথি-ভাজার গুঁড়ো মিশিয়ে অধিবাসের তত্ত্বের সঙ্গে কনের বাড়িতে পাঠাতে হয়। একে গন্ধতেল বলে। কনের বাড়ির সধবা মহিলারা ঐ গন্ধতেল একটু একটু মাথায় দেন। বিকালবেলা আবার পুকুর থেকে জল ভরে এনে বর ও কনেকে স্নান করানো হয়। স্নানের পূর্বে নাপিত এসে কামায়, কনের পায়ে আলতা পরিয়ে দেয়। স্নানের পর কনেকে সাজিয়ে দেওয়া হয়, যেন লগ্ন উপস্থিত হলেই বিবাহমণ্ডপে তাকে নিতে দেরি না হয়।

শ্রীহট্ট জেলায় বর বিবাহমণ্ডপে এসে দাঁড়ালে পিছন দিকে একটি পরদা ধরা হয়। তখন কনের মা গিয়ে বরের হাত দই দিয়ে ধুইয়ে পরে জল দিয়ে ধুইয়ে একটি সোনার আংটি পরিয়ে দেন। শাশুড়ি পরদার এ পিঠে থেকে কাজ করেন। বর পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। কেউ কাউকে দেখে না। একে দধিমঙ্গল বলে। শ্রীহট্ট ছাড়া অন্য জেলায় দধিমঙ্গল এ ভাবে করতে দেখি নি। তার পর বরকে পিঁড়িতে বসানো হলে পুরোহিত মন্ত্র বলেন এবং সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে বরকে কন্যাকর্তা বরণ করেন। তার পর বর একটু আড়ালে গিয়ে কন্যাকর্তার দেওয়া ধুতি চাদর ইত্যাদি পরে আবার বিবাহমণ্ডপে এসে একখানা চেয়ারে বসলে কনে

হাতে ফুল নিয়ে সাতবার তাঁকে প্রদক্ষিণ করে। প্রতি বারেই সামনে এসে ফুলগুলি বরের গায়ে ছিটিয়ে ফেলে ও হাত জোড় করে নমস্কার করে। একে ফুলছিটা বলে। সাতবার প্রদক্ষিণ হয়ে গেলে পরস্পর মালাবদল করে শুভদৃষ্টি করে। শুভদৃষ্টির সময় কোনো কোনো জেলায় একখানা ওড়না দিয়ে বরকনের মাথা ঢেকে দেওয়া হয়।

তার পর আবার এসে আসনে বসলে কন্যাকর্তা শাস্ত্রমত মন্ত্র উচ্চারণ করে কন্যাসম্প্রদান করেন। সম্প্রদানের পরই কন্যাকর্তার কাজ শেষ হল। তখন বরপক্ষের পুরোহিত এসে হোম করেন। পূর্ববঙ্গে বিবাহের রাত্রেই কুশণ্ডিকার কাজ শেষ হয়। কুশণ্ডিকার পর বরকনে আবার পায়ে হেঁটে কলাতলা সাতবার প্রদক্ষিণ করবে। তখন দুজনের আঁচলে গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হয়। তার পর ঘরে এসে বরকনেকে বসিয়ে কড়ি খেলা হয়। একটি চিত্র-করা মাটির সরা ও হাঁড়ি লাগে। ধান ভর্তি হাঁড়িতে একুশটি কড়ি দিতে হয়। বর কড়িগুলি কনের হাতে তুলে দিলে কনে কড়িগুলি ছিটিয়ে ফেলবে। বর আবার কুড়িয়ে হাতে তুলে দেবে। এইভাবে সাতবার খেলতে হয়। তার পর বরকে নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইয়ে বাসরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিবাহের রাত্রে বর কনে কেউই ভাত খায় না।

শ্রীঅমলা সেন
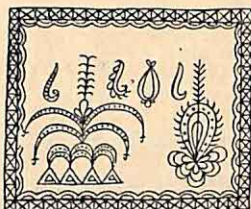
৫

# বিবাহের গান

পাকা দেখার দিন দেবকন্যাদের নিমন্ত্রণ

এখন যাও রে নারদ নিমন্ত্রণে, দুর্গামায়ের ঐ ভবন।
দুর্গা চললেন রঙ্গে,
কার্তিক গণেশ সঙ্গে,
আজি যাইতে হবে অযোধ্যাভুবন।
কালি রাম রাজা হবে কৌশল্যানন্দন,
সব যেয়ে করো গো মঙ্গলাচরণ।

২

এখন যাও রে নারদ গঙ্গামায়ের ঐ ভবন।
গঙ্গা চললেন রঙ্গে,
মকর বাহন সঙ্গে,

আজি যাইতে হবে অযোধ্যাভুবন।
কালি রাম রাজা হবে কৌশল্যানন্দন,
সবে মিলে করো গো মঙ্গলাচরণ।

৩

এখন যাও রে নারদ নিমন্ত্রণে, লক্ষ্মীমায়ের ঐ ভবন।
লক্ষ্মী চললেন রঙ্গে,
শঙ্খ পদ্ম সঙ্গে,
আজি যাইতে হবে অযোধ্যাভুবন।

এইভাবে সব দেবকন্যাদের আমন্ত্রণ গাওয়া হয়

নারদ চল চল বল কোন্ পথে যাব
আমরা এয়ো সব আনতে যাব কৈলাসভুবনে
আনব দুর্গামার চরণ ধরে।
যাব বৈকুণ্ঠ ভুবনে, আনব লক্ষ্মীমার চরণ ধরে। ইত্যাদি—

ধনুর্ভঙ্গ

রাম লক্ষ্মণকে সাজাইয়া দে, ও সুমিত্রে,
রামকে নিতে মিথিলায় শুনি রাজসভায়
এসেছেন আজ মুনি বিশ্বামিত্রে, ও সুমিত্রে
নয়নে কাজল, করে ঝলমল,
ললাট শোভে চন্দনেতে।
অরুণ বসন, করিয়ে যতন,
পরাইয়া দে, ও সুমিত্রে অতি সযতনে।

মাথে দিয়ে দূর্বা ধান, আশিস কল্যাণ
করগো সকলে মনোরঙ্গে
যেন জনকদুহিতা, জগৎ-লক্ষ্মী সীতা
নিয়ে আসে হরের ধনুক ভেঙ্গে।
হবে রাম জয় জয় সর্ব দেশ ময়
সীতা লয়ে রাম আসিবে ঘরে
হবে দুঃখ অবসান, জুড়াইবে প্রাণ,
রাম-সীতার চাঁদমুখ হেরে।

দেখ জনক রাজার ধাম
ধনুক ভাঙ্গিতে আইছেন, লক্ষ্মণ শ্রীরাম।
বিশ্বামিত্র মুনি সঙ্গে ভাই দুইজন।
মিথিলা নগরে আইসা দিলা দরশন।
যখন জন্মিলা সীতা জনক রাজার ঘরে।
আকাশ হৈতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
সেইকালে ধনুক আনি দিলা মহাদেবে।
যে ভাঙ্গিবে এই ধনু সীতা তাকে দিবে।
দ্বাদশ যোজন ঘর বিচিত্র নির্মাণ,
সেই ঘরে রাখিলেন হরধনুখান।
যত দেশে যত রাজা মহাবলবান,
দেখিয়া হরের ধনু ভয়ে কম্পমান।
পাত্র মিত্র লইয়া রইছেন জনক রাজন,
হেনকালে বিশ্বামিত্র দিলা দরশন।

জনক রাজা ডাক দিয়া বলে সভার ভিতরে,
যে ভাঙ্গিবে এই ধনু সীতা দিব তারে।
বাম হস্তে রামচন্দ্র ধরেন ধনুখান,
ডান হস্তে বাণ লৈয়া করেন সন্ধান।
তিন খণ্ড হইয়া ধনু ভাঙ্গিয়া পড়িল,
নারীগণ জয়ধ্বনি মঙ্গল গাইল।
স্বর্গ মর্ত ত্রিভুবনে হইল চমৎকার
ভাঙ্গিল হরের ধনু কৌশল্যাকুমার।
সাগরের ঢেউ গিয়া লাগিল লঙ্কায়,
রাবণের মাথার মুকুট ভূমিতে লুটায়।

ধনুর্ভঙ্গের খবর অযোধ্যায় পৌঁছল

শুন গো কৌশল্যা আজ শুভ সমাচার
হরধনু ভাঙ্গিয়াছে তোমারি কুমার
মিথিলা হইতে দূত এসেছে সভায়

অসম্পূর্ণ

কনে সাজানো

সাজিল কিশোরী, রমণী সুন্দরী।
বেঁধে ঝুলন-খোঁপা দিয়ে কনকচাঁপা
কি শোভা ইন্দ্রচাঁপা নবগুণে বেঁধে বেণী।
নাকে তিলকের ছটা, কামসিন্দুরের ফোঁটা
সিন্দুরের বিন্দু বিন্দু ইন্দুমুখে ত্রিপুরারি।

গলাতে সাত লহরী, সীতাহার চিক্ ভরি
কানেতে কানবালাতে কিবা শোভা মরি মরি
হস্তেতে রতনচুড়ি একদানা স্বর্ণঝুড়ি
বিচিত্র জলতরঙ্গ মিশ্রিদানা নূতন চুড়ি।
কোমরের চন্দ্রহারে গগনের চন্দ্রহারে
কি শোভা গুলবাহারে,
পাছাপাইড়া নীলাম্বরী।
নিন্দিয়ে জলের পদ্ম, চরণে চরণপদ্ম
ঝুমঝুমাঝুম হার বেকী গুজরী যেত শব্দ ভারি।
সাজিল কিশোরী।

দশরথ রাজা চার পুত্রের বিয়ে দিয়ে দেশে আসছেন

কিবা শোভা হেরি সইগো কিবা শোভা হেরি
দেশে আইলেন রামচন্দ্র গোলোকবিহারী
সইগো কিবা শোভা হেরি।
গুরু পুরোহিত ব্রহ্মচারী, বাবুয়ানা পাল্কি চড়ি
দেওয়ানজী, খাজাঞ্চি চলে, সাজাইয়া আম্বারী[৪]
সইগো কিবা শোভা হেরি।
হাতির উপর বৈছেন রাম সর্ব অঙ্গে ঝরে ঘাম
মাথায় সোনার ছাতা ধৈরাছে ভাণ্ডারী।
সইগো কিবা শোভা হেরি।

৪ হাতির উপর হাওদাকে আম্বারীও বলে।

চতুর্দোলায় দশরথ, ধুলায় ঢাকিয়া পথ
সঙ্গে চলে ঢাক ঢোল সানাই বাঁশরি
সইগো কিবা শোভা হেরি।
ভরত শত্রুঘ্ন সাথে লক্ষ্মণ চলিছেন রথে
সোনার চান্দোয়া দোলে রথের উপরি
সইগো কিবা শোভা হেরি।
উজির নাজির বরকন্দাজ মেম সহিতে ইংরাজ
বিচিত্র সজ্জায় সাজে অযোধ্যা নগরী
নাগা কুকী খাস্থার জাত পথে পথে খায় ভাত
সাথে সাথে চলে তারা বিনা আচমনে
সইগো কিবা শোভা হেরি।
পথে যদি হয় চুরি উজির নাজির নিবে ধরি,
হাতকড়া শিকল ছড়া দিবে লোহার বেড়ি
সইগো কিবা শোভা হেরি।

বধূবরণ

হের লো এলো শ্রীরামধনে এলো জানকী সনে
আনন্দ লহরী আজি উঠিল প্রাণে
আজি উঠিল প্রাণে, আজি উঠিল প্রাণে,
আজি উঠিল প্রাণে।
চল চল সখি রাম পাশে যাই
রাম সীতা ঘরেতে উঠাই

কণক আসনে চল বসাই দুজনে
চল বসাই দুজনে, চল বসাই দুজনে
চল বসাই দুজনে।
চকোর চকোরী সুধা আশে ধায়
সুধা পিয়ে মাতোয়ারা প্রায়
দেখ নীল গগনে যেন চাঁদ উঠেছে
যেন চাঁদিমা হাসে যেন চাঁদিমা হাসে,
যেন চাঁদিমা হাসে।

বধূবরণ

বরণ কর বধূ নন্দন, স্বর্ণথালেতে গন্ধ চন্দন
সব সখি মিলি কর আয়োজন
গৃহের বাহির প্রাঙ্গণে
বরণ কর বধূ নন্দন—
ধান্য দূর্বা লইয়ে হাতে, রাখি দেয় বর বধূর সাথে
আসিল পুত্র বধূর সাথে
বরণ করগো যতনে।
স্বর্ণঝারি ভরি তীর্থ বারি, আসিলেন নিয়ে
সুমিত্রা সুন্দরী, মিষ্টান্নের থালা কৈকেয়ীর হাতে
চলিলেন গজগমনে।
এসো মা লক্ষ্মী বসো মা কোলে এতকাল ছিলে কোথায় ভুলে
চাঁদ মুখে ডাকো মা, মা, বলে শুনিয়ে জুড়াই শ্রবণে।

আমারি ঘরেতে হইয়ে অচলা  বসতি কর মা এস গো কমলা
আঁধার কুটির হউক উজলা
বধূমা তোমারি কল্যাণে।

পাশাখেলা বা কড়িখেলা

মোদের রাইয়ের সনে ক'রে পণ
আজ পাশা খেল নারায়ণ,
যদি হারে রাই, শুনহে কানাই,
শ্রীচরণে হব দাসী।
গোপিনী সবাই
তোমার পদে দিব পুষ্প চন্দন,
আজ পাশা খেল নারায়ণ।
যদি হার হরি, কেড়ে নিয়ে বাঁশরি
তোমায় নারীর কাপড় পরাইয়ে সাজাব নারী
তোমার হস্তেতে দিব কঙ্কণ,
আজ পাশা খেল নারায়ণ।

২

ওমা ছি, ছি, নাগর হারলে,
তুমি পুরুষ হয়ে নারী সাথে
খেলিতে না পারলে।

তুমি কি দিয়ে চরাবে ধেনু-বৎসগণ
কি দিয়ে হরিবে গোপিনীর মন,
তোমার সব জারিজুরি, ছলনাচাতুরী
সব কিশোরী ভাঙ্‌লে।

পাশাখেলার গান

ছি, ছি, হেরে লাজে মরে যাই,
নারীর সনে হারিলে কানাই
নাগর তোমার যত অহংকার দেখি সকলি অসার
রাধাচক্রে প'ড়ে মান ভাঙিল তোমার।
এসো হস্তেতে কঙ্কণ পইরাই,
নারীর সনে হারিলে কানাই,
তোমার যত আভরণ, সব ত্যজ হে এখন
নারী সভার মাঝে আজি পেলে অপমান।
এসো ললাটে সিন্দুর পইরাই
নারীর সনে হারিলে কানাই।

ফুলশয্যার গান

শিবানী যতনে আজি সাধ শুভ রজনী
বিলম্বের কি প্রয়োজন? গেল গেল যামিনী
বসন ভূষণ যত
দিলেন গিরি নানা মত
সেই আভরণে ত্রিলোচনকে সাজাইয়া দেও এখনি।

দিয়ে নারিকেলের জল,
ধোয়াও শিবের পদতল
ধোয়াইয়ে অবশেষে, মুছাইয়ে দিবে কেশে
গন্ধচন্দনে আজি মহেশ তোষে মোহিনী।
দধিদুগ্ধ সর-নবনী, সন্দেশ বাতাসা চিনি
রসকড়া ছানাবড়া সরভাজা গঙ্গাজলি।
আনারস আতাফল, কমলালেবু শ্রীফল
আশুতোষে পরিতোষে ভোজন করাল ভবানী।
এখন যা রে নাপিত ঢাকা শহর নরুণ আনিতে
ঢাকা শহরের চক্‌বাজারে
ভাল নরুণ তৈয়ার করে
সেই নরুণ আনিয়ে দে রে রামধন কামাইতে।
কি শুভ আনন্দ আজ জনকভবনে
করে ঘট স্থাপিত, কামায় নাপিত
শ্রীরামধনে, জানকীধনে,
শিরে ছত্র চাউল কড়ি
আনন্দে শীল করে খেউরি
বাম হস্তে দর্পণ ধরি বৈসে আসনে।
ধোপায় দেখাইল তৈল, আছে রীতি ব্যবহার
সুগন্ধি আলতা পরায় সীতার চরণে।

জলভরা

যমুনাপুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী।
আজ কেন গো শুনিনা বংশীধ্বনি॥

একে শ্যামচাঁদের ব্যথা।
আরও লোকের নানা কথা ॥
মনে লয় পাষাণে মাথা দিব ওগো প্রাণ সজনী।
যখনে রন্ধনে বসি তখন শ্যামে বাজায় বাঁশি
মনে লয় শ্যাম দেখে আসি
কালনাগিনী ননদিনী
যমুনাপুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী ॥

২

আমি কী দেখিলাম জলে গো নবীন নীরদ শ্যাম।
কী দেখিলাম জলে সই গো, কী দেখিলাম জলে ॥
গগন মণ্ডলে যেন বিজলী চমকে গো
নবীন নীরদ শ্যাম।
নবীন মেঘে সৌদামিনী অঙ্গের লাবণী।
বৈজয়ন্তী বনমালা ঝোলে শ্রীচরণে
নবীন নীরদ শ্যাম।

স্নান

আমার ক্ষুধায় কাতর বাছাধন
স্নান করাও গো যত সখিগণ।
করে কালী সাধনা পেয়েছি কালিয়া সোনা
অল্প করে দিয়ো জল গো অধিক দিয়ো না।

বাংলার স্ত্রী-আচার

রৌদ্রে মলিন হ'ল চাঁদবদন
স্নান করাও গো সব সখিগণ।
শুন সখিগণ, এই নিবেদন
ধীরে ধীরে কর সবে হরিদ্রা মর্দন
আমার বড় দুঃখের নীলরতন
স্নান করাও গো যত সখিগণ ॥

বাসিবিবাহ

তোরা দেখ সজনি লো,
তোরা হের নয়নে গো,
যখন বেইফিরে[৫] রাম সীতার সনে।
আসিয়ে ঋষিবর্গ
দিতেছেন সূর্য অর্ঘ্য
বামেতে বসন ঢাকা মনোমোহিনী গো
সূর্যের কিরণেতে চাঁদমুখ ঘামিতেছে।
সখিরা এসে বলে দাও মুছায়ে গো।
রামচন্দ্র ধেয়ে চলে,
চলিতে অঙ্গ দোলে
জানকীর কোমল চরণ আর চলেনা গো।

শ্রীঅমলা সেন -সংগৃহীত

৫ সপ্তপদীগমনকে বেইফিরা বলে।